প্রশ্ন ১ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পের নামকরণ কতদূর সার্থক হয়েছে বলো। ৫

উত্তর ◊ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী গল্পটির নামকরণ 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' করা হয়েছে। গল্পটির চরিত্রই এখানে মূল ভাব প্রতিষ্ঠার আধার। কিন্তু নামকরণে সেই চরিত্রই নেই। এমনকি কোনো ঘটনা বা কাহিনি সূত্রেও নেই। লেখক একটি বিশেষ ব্যঞ্জনাকে গল্পের নামকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন—তা হচ্ছে জীবন অস্তিত্বের মূল। নামের শেষে একটি জিজ্ঞাসাও রেখেছেন। হয়তো মূল চরিত্রের অসহায়তা বোধের ভাব প্রকাশ করতেই গল্পের নামকরণের শেষে জিজ্ঞাসার প্রয়োগ ব্যঞ্জনা থাকতে পারে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তববাদী লেখক। তিনি কোনোকালেই ভাগ্যে বিশ্বাসী নন—ঈশ্বর-বিশ্বাসীও

Scanned with CamScanner

নন। সুতরাং গল্পে শোষিত মানুষের বাঁচার প্রশ্নে ভাগ্যের স্বীকৃতির ইঙ্গিত এখানে নেই। এমনকি দৈবের কাছে করুণ আবেদন নিবেদনও নেই। যা আছে তা হল লেখকের একটি অনুসন্ধিৎসু মনের ব্যঞ্জনাগর্ভ স্বভাব ভঙ্গিমা।

এ কারণেই অন্নহীন মুমূর্ষু মানুষদের দেখে মৃত্যুঞ্জয় অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্ত করে—"কারো মুখে নালিশ নেই, কারো মনে প্রতিবাদ নেই; কোথা থেকে কীভাবে কেমন করে সব ওলোটপালট হয়ে গেল, তারা জানেনি, বোঝেনি—কিন্তু মেনে নিয়েছে"। এই সব লোকের ভিড়ে মৃত্যুঞ্জয়কে এনে লেখক প্রকারান্তরে—'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' নামকরণ করেছেন। তাই নামকরণের তাৎপর্য অতি গভীর ব্যঞ্জনাময়—কিন্তু সুতীব্রভাবে তাদের বাঁচার উপযোগী নালিশ ও প্রতিবাদের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন।

আসলে কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না, নিজেদের বাঁচাতে তাই নিজেদেরই উদ্যোগ নিতে হয়। তাই নামকরণে কোনো হতাশা বা শূন্যতাবোধ নেই। বরং অসংখ্য নিরন্ন মানুষের ভিড়ে মৃত্যুঞ্জয় সহ সমস্ত মানুষের বাঁচার সূত্র ধরিয়ে দেওয়ার সুদূরপ্রসারী ব্যঞ্জনা আভাসিত। তাই নামকরণ সার্থক ও যথাযথ বলা হয়।

প্রশ্ন (২) "কয়েক মিনিটে মৃত্যুঞ্জয়ের সুস্থ শরীরটা অসুস্থ হয়ে গেল"—মৃত্যুঞ্জয় কে? কয়েক মিনিটে তার অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণ কী? এই অসুস্থতা তার জীবনের ওপর কীরূপ প্রভাব ফেলে? ১+১+৩

উত্তর ◈ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র, একজন সংবেদনশীল মধ্যবিত্ত মানসিকতার মানুষ।

অফিস যাওয়ার পথে অনাহারে মানুষের মৃত্যু দেখে মৃত্যুঞ্জয় অসুস্থ হয়ে পড়ে।

মৃত্যুঞ্জয় সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের সংবেদনশীল মানুষ। তাই দুঃখ, ব্যথা, বেদনা সহজেই তাকে কাতর করে তোলে। নিজেকে সে স্থির রাখতে পারে না। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। মনে আঘাত পেলে মানসিকভাবে তার প্রতিক্রিয়া হয়। আর এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার অনিবার্য পরিণতিতে সে অফিসে গিয়ে নিজের ঘরটিতে ঢুকেই ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে। একটু বসে সে কলঘরে চলে যায়। বাড়ি থেকে ভরপেট খেয়ে আসা ডাল, ভাত, ভাজা, তরকারি, মাছ, দই সবই বমি করে উগরে দেয়। এরপর নিজের ঘরে ফিরে আসে—কাচের গ্লাসে জল খেয়ে শূন্য দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মানসিক দিক দিয়েও সে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অনাহারে মৃত্যু মৃত্যুঞ্জয়কে তার নিজের অবস্থান থেকে সরিয়ে এনে সর্বহারা হাভাতে মানুষদের অবস্থায় নিয়ে ফেলে। তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে নিজেকে একমুঠো অন্নপ্রার্থী ভেবে তাদের মতোই হয়ে যায়। মানসিকভাবে সে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। একজন সুস্থ মানুষ শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হয়ে পড়ে—রাস্তায় ভিক্ষা করে বলে—"গাঁ থেকে এইচি, খেতে পাইনে বাবা, আমায় খেতে দাও"।

প্রশ্ন (৩)

Scanned with CamScanner

উত্তর ◊ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পে নিখিল মৃত্যুঞ্জয়ের সহকর্মী, সহমর্মী একজন মধ্যবিত্ত মনের মানুষ।

নিখিল তার বন্ধু সহকর্মী মৃত্যুঞ্জয় সম্পর্কে অনুমান করে যে মৃত্যুঞ্জয় একটা কোনো বড়ো সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে।

নিখিল তার অনুমানকে ব্যাখ্যা করতে যে উপমা দিয়েছে তা হল—সেই স্বচ্ছ সমস্যার অকারণ অর্থহীন অনুচিত কাঠিন্যে মৃত্যুঞ্জয় শার্সিতে আটকানো মৌমাছির মতো মাথা খুঁড়ছে।

শার্সি হল কাচের কপাট বা দরজা। কাচ স্বচ্ছ জিনিস বলে মৌমাছি বুঝতে পারে না যে তার যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা আছে। ফলে শার্সিতে বাধা পেয়ে সে একই স্থানে আবদ্ধ থেকে ছটফট করতে থাকে। মৃত্যুঞ্জয়ের অবস্থাও মৌমাছির মতো। সে মনে মনে ভাবছে নিজের ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টায় হয়তো বা কিছুটা হলেও অনাহারে মৃত্যু রোধ করতে পারবে। কিন্তু সে যে রাস্তা সে দেখতে পাচ্ছে তা কাচের শার্সির সমতুল্য—সে বুঝতে পারছে না সেই প্রতিবন্ধকতা সে কীভাবে দূর করতে পারবে।

মৃত্যুঞ্জয় সেখান থেকে পিছিয়ে এসে অবশ্য কোনো পথের সন্ধান পেলেও পেতে পারে। কিন্তু মৌমাছির মতোই কাচের দরজাকে তার উপলব্ধির রাস্তা বলে ভেবে নিয়েছে। তার ফলে মৃত্যুঞ্জয়ের অবস্থা হয়েছে শার্সিতে আটকানো মৌমাছির মতোই—ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। আর সে দিক দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় সম্পর্কে নিখিলের উপমাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

প্রশ্ন ৫ "চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে নজরে পড়ল"—কার কোথায় কী নজরে পড়ল? নজরে আসা বিষয়টি অবলম্বন করে নজর-কর্তার মানসিকতা বিচার করো। ১+১+১+২

উত্তর ◊ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ নিখিলের নজরে পড়ে। বিক্ষুব্ধচিত্তে আনমনে ভাবতে ভাবতে বসার সময় হঠাৎ সংবাদপত্রের

Scanned with CamScanner

একটি পাতায় নিখিলের দৃষ্টি পড়ে। কোনো একটি স্থানে গোটা কুড়ি মৃতদেহকে ভালোভাবে সৎকার করে স্বর্গে পাঠানো হয়নি। আর তাই নিয়ে বেশ কিছু তীক্ষ্ণধার মন্তব্য করা হয়েছে।

নজরে আসা বিষয়টি নিয়ে নিখিলের মানসিকতা অন্য সব বিষয়ের মতোই স্বাভাবিক। সে যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে ওই ব্যাপারটি নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য করার কিছুই নেই। এটাই পৃথিবীর নিয়ম—নিজ নিজ কর্মে অবিচল থাকা। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্যমতো কাজ করে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে। তাতে কেউ বাঁচে—আবার কেউ মরে। তাই বলে মৃত ব্যক্তিদের নিয়ে অকারণে বাদানুবাদ করা তার পছন্দ নয়। আবার এটাও ঠিক যে কোনো অকালমৃত্যুই কাম্য নয়। বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ, আকাল, খাদ্যাভাব কোনোটাকেই সে চায় না। কিন্তু পরিস্থিতি যদি বিরূপ হয় তবে কিছুই করার নেই। বরং যারা বেঁচে আছে তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকেই সে যথার্থ মনে করে। সেও সমাজের জন্য কিছু করতে চায়, তবে তা কখনোই নিজের সর্বস্ব দিয়ে নয়, নিজেকে বাঁচিয়ে। নিজেকে বাঁচিয়ে সে অপরকে বাঁচাতে চায়। তাই খবরের কাগজের সংবাদকে সে ধর্তব্যের মধ্যে এনে বিস্ময়-বিমূঢ় হওয়ার পক্ষপাতী নয়। তবে সে আপনি বাঁচলে বাপের নাম—এই নীতিতেও বিশ্বাসী নয়।

প্রশ্ন ৬ "নিখিল ভাবছিল, বন্ধুকে বুঝিয়ে বলবে"—নিখিলের বন্ধুর নাম কী? নিখিল বন্ধুকে কী বুঝিয়ে বলতে চেয়েছে? তার ভাবনার পরিণতি কী হয়? ১+১+৩

উত্তর ◈ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' ছোটোগল্পে নিখিলের বন্ধুর নাম মৃত্যুঞ্জয়।

নিখিল অনাহারের মৃত্যু বিষয়ে তার বন্ধু মৃত্যুঞ্জয়ের নেওয়া পদক্ষেপের বিষয়ে কিছু বুঝিয়ে বলতে চেয়েছে। তার হয়তো ইচ্ছা ছিল বন্ধুকে বলবে অনাহারে মৃত দেশের মানুষকে এভাবে বাঁচানো যায় না। তার বোঝা উচিত ছিল, যে অন্ন পাওয়া যাচ্ছে তা তো কারও না কারও পেটে যাবেই। তাছাড়া যে রিলিফের কাজ চলছে তা শুধু একজনের বদলে অন্যকে খাওয়ানো। এটা একজনকে বঞ্চিত করে অন্যকে বাঁচানোর চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যাপারটা শুধু আড়ালে যারা মরছিল তাদের মরতে দিয়ে, চোখের সামনে যারা মরছে তাদের কয়েকজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করা, কিন্তু কোনো কথাই সে বলতে পারল না। আসলে নিখিল জানাতে চেয়েছে যে নেহাৎ আবেগের বসে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। আর সে যা করেছে তা তার জীবনের পক্ষেও চরম ক্ষতিকর।

নিখিল তার বন্ধুকে যা বলতে চেয়েছিল তা বলতেই পারেনি। সে অন্তত বন্ধুর চোখে আঙুল দিয়ে তার ভুলটা শুধরে দিতে পারত। তার সুবিবেচনায় সে উপলব্ধি করে যুক্তিহীন আবেগের বশবর্তী হয়ে সে যা করতে চাইছে, তাকে তা থেকে কোনোমতেই নিরস্ত করা যাবে না। বেশি বলতে গেলে বন্ধুত্বের মধ্যে ফাটল ধরবে। এইসব সম্ভাবনার কথা ভেবে নিখিল তার ভাবনার সমাধি করে। তবে মৃদুভাবে বন্ধুকে জানাল ভুরিভোজনটা অন্যকে, তবে না খেয়ে মরাটাও ঠিক নয়। একারণেই সে যথাসম্ভব খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে, এভাবেই সে তার আগের ভাবনা থেকে কিছুটা সরে আসতে বাধ্য হয়।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ৭ **"মন্তব্য শুনে মৃত্যুঞ্জয় ঝাঁঝিয়ে উঠল"—আমি কী করব?—(ক) কার কোন্ কথায় মৃত্যুঞ্জয়ের এই তীব্র প্রতিক্রিয়া? (খ) মৃত্যুঞ্জয়ের এই অসহিষ্ণুতার কারণ কী?** ২+৩

উত্তর ◈ (ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' ছোটোগল্পে নিখিলের মন্তব্য শুনে মৃত্যুঞ্জয় ঝাঁঝিয়ে ওঠে। নিখিল মৃত্যুঞ্জয়কে জানায় যে টুনুর মার যা স্বাস্থ্য, তাতে দিন পনেরো-কুড়ি সে টিকতে পারে—এই কথায় মৃত্যুঞ্জয় ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

(খ) মৃত্যুঞ্জয় ইদানিং চরম অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে—তার কারণ তার দেখা ফুটপাথে অনাহারে মৃত্যু। প্রচণ্ড আবেগী মন নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় অনাহারের কারণ খুঁজতে থাকে। দরদি মন নিয়ে সেও উপলব্ধি করে—যে লোকটা বেঁচে থাকতে পারত সে লোকটি অনাহারে মরে গেল তার জন্য সেও দায়ি। দেশের এই দুর্ভিক্ষের দিনে জেনেশুনে সে তো চার বেলা খেয়েছে। লোকের অভাবে যথেষ্ট রিলিফ ওয়ার্ক হচ্ছে না, বলে ভেবেছে। অথচ নিজে সময় কাটানোর উপায় ভেবে পায়নি।

নিখিল বুঝতে পারে মৃত্যুঞ্জয়ের দরদি মন তাকে অস্বাভাবিক করে তুলেছে—তাকে করে তুলেছে চরম অবসাদগ্রস্ত। আর তা থেকেই মৃত্যুঞ্জয় নিরন্ন অনাহারী মানুষের অভাব দূর করার চেষ্টায় নিজের স্ত্রী-সন্তান-পরিবারদের উপেক্ষা করতে থাকে। সে তার সর্বস্ব অভাবী মানুষদের জন্য দান করে দিতে চায়। আর এ ব্যাপারে তার কাজের কোনো বিরুদ্ধতা তার অপছন্দ। বিপরীত কোনো মতাদর্শ তার প্রত্যাশার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সে মোটেই তা পছন্দ করে না। ফলে নিখিলের বলা কথা অনুসারে মৃত্যুঞ্জয় মনে করে তার স্ত্রী তার ইচ্ছা পূরণের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছে। আর এ কারণেই নিখিলের কাছে তার স্ত্রীর স্বাস্থ্য ও বেঁচে থাকার সম্ভাবনার কথা শুনেই সে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ৯ "একটা কাজ করে দিতে হবে"—(ক) কে কাকে কী কাজ করতে অনুরোধ করে? (খ) তার এই কাজকে কি তুমি সমর্থন করো? (গ) কেন? ১+১+৩

উত্তর ◊ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পের প্রধান চরিত্র মৃত্যুঞ্জয় তার অফিস কলিগ নিখিলকে একটা কাজ করে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। মৃত্যুঞ্জয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছা দুঃস্থ সর্বহারাদের পাশে দাঁড়িয়ে সে কিছু সাহায্য করতে চায়। এই কাজে তার মাইনের সমস্ত টাকাটাকে রিলিফ ফান্ডে দিয়ে আসার জন্য নিখিলকে অনুরোধ জানায়।

(খ) মৃত্যুঞ্জয়ের এই কাজকে আমি সর্বোতভাবে সমর্থন করি না।

(গ) মানুষ মাত্রেই বেঁচে থাকতে চায়—তার বাঁচার অধিকার আছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঠিক যে নিজে বেঁচে থাকার জন্য অন্যকে দুরবস্থায় ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যা কিছু করা হোক না কেন সব ক্ষেত্রেই নিজে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি।

আবার মানুষ হিসাবে সামাজিকতা বজায় রাখতে হয়—দেশ ও দশের সেবাও করতে হয়। কিন্তু তা বলে নিজেকে বিপন্ন করে পরিবার পরিজনকে দুরবস্থায় ফেলে মন্বন্তর কবলিত মানুষদের সর্বস্ব দান করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় সেটাই করতে উদ্যত হয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারে ন-জন সদস্য। সে তাদের কথা একবারও না ভেবে সর্বস্ব দান করতে উদ্যত হয়েছে—যা মানুষের বিবেচনা প্রসূত কাজ বলে মনে করা যায় না। নিখিলের নিষেধ সত্ত্বেও সে নিজেকে ও তার পরিবারকে দেখেনি। মাস মাইনেতে তার নিজেরই চলে না—প্রতি মাসে ধার দেনা করতে হয়। এমন অবস্থায় মাইনের সমস্ত টাকা রিলিফ ফান্ডে দেওয়া কোনো বিবেচক মানুষের কাজ হতে পারে না। তাই মানবিকতাবোধ যতই তীব্র হোক না কেন, মৃত্যুঞ্জয়ের এই অবিমৃষ্যকারিতা কোনো মতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

প্রশ্ন ১০ "সে শুধু বলল"—(ক) সে কে? সে কাকে বলল? (খ) প্রসঙ্গ কি (গ) তার ওই সব কথা বলার কারণ কী? ১+১+৩

উত্তর ◊ (ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পে 'সে' বলতে গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র মৃত্যুঞ্জয়ের সহকর্মী নিখিলের কথা বলা হয়েছে।

নিখিল তার সহকর্মী বন্ধু মৃত্যুঞ্জয়কে কিছু বলল।

(খ) নিখিলের বক্তব্য ভুরিভোজনটা অন্যায়—কিন্তু না খেয়ে মরাও তেমনি উচিত নয়। এ কারণে সে নিজে কেটে ছেঁটে যতদূর সম্ভব খাওয়া কমিয়েছে; এখন বাঁচার জন্য যতটুকু খাওয়া দরকার সে ততটুকুই খায়। তবুও দেশের লোকের জন্য তার সর্বস্ব সে দিয়ে দিতে পারে না। কারণ অপরের পাশে দাঁড়ানোর জন্য নিজেরও বেঁচে থাকা দরকার। তাই বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু দরকার তাই যদি সে সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়, তবে সেটুকু অপরকে না দিয়ে সে নিজেই খাবে। নিখিল আরও জানায় যে নীতি ধর্মের দিক থেকে সে বলছে না—তবে সামাজিক দিক থেকে বিচার করে তার মনে হয়, দশজনকে খুন করার চেয়ে নিজেকে না খাইয়ে মারা একটা বড়ো পাপ—কারণ তা আত্মহত্যার শামিল।

(গ) নিখিলের এইসব কথা বলার আপাত কারণ মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে সমাজধর্মের ব্যাপারটি জাগিয়ে তোলা। মৃত্যুঞ্জয় দরদি মানুষ, সে আবেগপ্রবণও বটে। নিখিল তার মধ্যে উৎসারিত

Scanned with CamScanner

আবেগের কিছুটা প্রশমন করতে চেয়েছে। আসলে নিখিল তার ভাবপ্রবণ, আবেগপ্রবণ বন্ধু মৃত্যুঞ্জয়কে বাস্তবের কঠিন মাটিতে নামিয়ে এনে তার সম্বিত ফেরাতে চেয়েছে। নিখিল চায় মৃত্যুঞ্জয় আত্মসচেতন হোক। নিজের পরিবার পরিজনদের প্রতি কর্তব্য সচেতন হোক। তার নিজের পরিবারকে ধ্বংসের পথে ঠেলে না দিয়ে, তাদের রক্ষক হয়ে উঠুক। নিখিল মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখার অভিপ্রায় এবং তাকে সহজ ও স্বাভাবিক করার কারণেই এই কথাগুলি বলেছে।

প্রশ্ন (১১) "দশজনকে খুন করার চেয়ে নিজেকে না খাইয়ে মারা বড়ো পাপ"—(ক) বক্তা কে? (খ) কাকে কথাটি বলেছে? (গ) বক্তা কেন কথাটি বলেছে—বুঝিয়ে বলো। ১+১+৩

উত্তর ◊ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পের অন্যতম চরিত্র নিখিল একথা বলেছে।

(খ) সে তার সহকর্মী বন্ধু মৃত্যুঞ্জয়কে একথা বলেছে।

(গ) নিখিলের বন্ধুপ্রীতি খুবই স্বাভাবিক। তার ঐকান্তিক চেষ্টা মৃত্যুঞ্জয়কে আবার সমাজ সচেতন করে তোলা। তবে মনে হয় মানবতার খাতিরে মৃত্যুঞ্জয়ের কাজ নীতিধর্মের দিক থেকে যুক্তিযুক্ত হলেও সমাজধর্মের দিক থেকে সঠিক নয়। সমাজে সবাই বাঁচতে চায়। সমাজকে বাঁচাতে হলে আগে নিজে বাঁচাটা দরকার। কথায় আছে—'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'। অর্থাৎ যেকোনো ভালো বা খারাপ কাজ করার জন্য নিজে বাঁচাটা অত্যন্ত দরকার।

আদর্শ-নীতি-আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে মনের শান্তি মিলতে পারে—কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট নয়। মৃত্যুঞ্জয় সমাজের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে নিজে না খেয়ে সবাইকে বাঁচাতে চেয়েছে। কিন্তু তাতে সকলকে বাঁচানো যাবে না। বরং তাতে নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় হলও তাই।

মৃত্যুঞ্জয় অনাহারীদের কথা ভাবতে ভাবতে তাদের সঙ্গে মিশতে মিশতে তার নিজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে ফেলে। তার পূর্বের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হল। নীতিধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সমাজধর্মকে সে অবজ্ঞা করে বসল। সামাজিকতাকে অগ্রাহ্য করে সে শুধু মাত্র নিজেই মরল না—তার পরিবার পরিজনদেরও অকূলপাথারে ভাসিয়ে দিল। শুধু তাই নয়—আত্মহত্যা মহাপাপ হলেও মৃত্যুঞ্জয় সেই আত্মহননের পথকেই বেছে নিয়েছে। এই সব কথা চিন্তা করেই নিখিল মৃত্যুঞ্জয়কে কথাটি বলেছে।

প্রশ্ন (১২) "অন্ন থাকতে বাংলায় না খেয়ে কেউ মরত না"—(ক) কে কাকে কোন্ প্রসঙ্গে কথাটি বলেছে? (খ) তাৎপর্য কী? ১+১+৩

উত্তর ◊ (ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পে বক্তা নিখিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে পাশবিক স্বার্থপরতা কথা প্রসঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়কে বলছে। নিখিল মনে করে ব্যক্তির স্বার্থপরতা দরকার। অন্তত ব্যক্তির অস্তিত্বের জন্য সমাজে স্বার্থপরতার প্রয়োজন আছে। তবে সেই স্বার্থপরতা যেন কখনও মাত্রা ছাড়া না হয়।

(খ) খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন। এর মধ্যে অন্ন বেঁচে থাকার জন্য একান্ত দরকার। অথচ এক শ্রেণির মানুষ তা কুক্ষিগত করে অন্য মানুষদের অবলম্বন ছিনিয়ে নেয়। সমাজের এই মানুষগুলি স্বার্থপর বলেই এমন কাজ করে। যারা স্বার্থপরতা দেখিয়ে খাদ্য মজুত করে, তাদের অন্নাভাব হয় না। কিন্তু যারা তা দেখাতে পারে না, যারা উদার, যারা নীতিধর্মের

Scanned with CamScanner

মানসিকতায় পুষ্ট হয়ে নিজেদের খাদ্য, অন্ন, বস্ত্র অকাতরে বিলিয়ে দেয়, তাদের ঘরে অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। খাদ্য সংকটে পতিত হয়ে তারাই মারা যায়। সামান্য একমুঠো অন্নের জন্য তারা দোরে দোরে ছুটে মরে—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। দুটো ভাতের বদলে সামান্য একটু ফ্যানের জন্য কাতর প্রার্থনা করে। ডাস্টবিনের ধারে নোংরা আবর্জনায়, লঙ্গরখানায় বাঁচবার রসদ খোঁজে। নিখিলের প্রত্যাশা এইসব মানুষকে যদি স্বার্থান্ধ আত্মপরায়ণ করা যায়, তবে তারাও অন্যদের খাদ্য মজুত করে রাখতে পারত, কিংবা সমবেতভাবে মজুত করে রাখা খাদ্যদ্রব্য উদ্ধার করে নিজেরাই ভোগ করতে পারত। আর তার ফলে মানুষকে না খেয়ে মরতে হত না।

প্রশ্ন ১৩ "ওটা পাশবিক স্বার্থপরতা"—(ক) কে কোন্ বিষয়কে পাশবিক স্বার্থপরতা বলে উল্লেখ করেছে? (খ) তার এরকম বলার কারণ কী? ১+১+৩

উত্তর ◊ (ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র মৃত্যুঞ্জয় একথা বলেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের কৃতকর্মের আশু পরিণামের কথা বোঝাতে গিয়ে নিখিল জানায় যে সে যা করতে চায়, তাকে নীতিধর্মের দিক দিয়ে সমর্থন করা গেলেও সমাজধর্মের দিক দিয়ে মোটেই সমর্থন করা যায় না। বরং সেই সমর্থন করা অনৈতিক ও পাপ। নিখিল বলে সমাজধর্মের দিক বিচার করলে দশজনকে খুন করার চেয়ে নিজেকে না খাইয়ে মারা পাপ—তা আত্মহত্যার শামিল, আর আত্মহত্যা মহাপাপ। নিখিলের এই সব ধ্যানধারণাকেই মৃত্যুঞ্জয় পাশবিক স্বার্থপরতা বলেছে।

(খ) নিখিলের মতো মৃত্যুঞ্জয়ও যথেষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ। কিন্তু তার যুক্তির পিছনে আবেগ ও দরদ এতটাই সক্রিয় যে তার সেসব যুক্তি তার পক্ষে এবং তার পরিবারের পক্ষে চরম বিপদের কারণ হয়ে ওঠে। আর এক্ষেত্রে তার নীতিবোধ এবং আদর্শ একপেশে হয়ে যায়। মৃত্যুঞ্জয় মনে করে যে সে তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে। আর সেই সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সে সব কিছুই ত্যাগ করতে রাজি। এর ফলে সে তার ভাবনার বাহক হয়ে পড়ে। তার এই কাজের মধ্যে, যুক্তির মধ্যে নিজের পরিবার, ছেলে-মেয়েসহ অন্যান্যরা কেউ নেই। যারা আছে তারা এদেশের মানুষ, এই সমাজেরই অঙ্গ। মৃত্যুঞ্জয় তাই সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যক্তি-পরিবারের দায়িত্বকে কর্তব্যের মধ্যে না আনার কারণেই কথাটি বলে। আর একথা বলার মধ্যে সে নিজের কাজ, যুক্তিকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে মাত্র।

প্রশ্ন ১৪ "তারা জানেনি, বোঝেনি, কিন্তু মেনে নিয়েছে"—(ক) কার লেখা কোন্ গল্পের অন্তর্গত? (খ) কাদের সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে? (গ) তাৎপর্য কী? ১+১+৩

উত্তর ◊ (ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পের অন্তর্গত।

(খ) তারা বলতে এখানে দুর্ভিক্ষপীড়িত অনাহারী মানুষদের বোঝানো হয়েছে। দুর্ভিক্ষের কারণে শহরে আসা প্রাণ বাঁচানোর ঐকান্তিক আর্তি নিয়ে পথের ধারে, ডাস্টবিনের পাশে, গাছের নীচে, খোলা ফুটপাথে, লঙ্গরখানার সামনে লাইন দিয়ে থাকা মানুষদের বোঝানো হয়েছে।

(গ) গ্রামের থেকে আগত মানুষগুলি জীবনের জটিলতা বোঝে না—তারা জানে না, তাদের দুরবস্থার কারণ কী? তাদের দুরবস্থার জন্য দায়ী কে? দুর্ভিক্ষের কারণ তারা বুঝতে পারে না। কেন কতিপয় মানুষ ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য খাদ্যদ্রব্য মজুত করে রেখে কৃত্রিম খাদ্যাভাবের সৃষ্টি

Scanned with CamScanner

করে। তারা মিনতি, প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। সম্মিলিত প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে তুলতেও তারা অক্ষম। কেবল নিজেদের দুরবস্থার জন্য তারা কপাল চাপড়াতে পারে—আর নিজের অদৃষ্টের দোহাই পাড়তে পারে। আর নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো অর্ধচেতন মানুষের প্যানপ্যানানির মতো ঝিমানো সুরে নিজের দুর্ভাগ্যের দোহাই দিতে পারে।

আসলে এইসব সহজ সরল নিরন্ন মানুষগুলি কোনো কিছুরই কারণ খুঁজতে শেখেনি। অবস্থার বিচার করতেও পারে না। কোথা থেকে কীভাবে সব ওলোটপালোট হয়ে যায়—তাদের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, তাও তারা জানে না, জানার চেষ্টাও করে না। আসলে এদের কোনো প্রশ্ন নেই—কারণ খোঁজার আগ্রহ নেই, কোনো বিচারবোধ নেই, আর এই ব্যাপারটাই তারা বোঝে না। কেবল পরিস্থিতির শিকার হয়ে দুর্ভাগ্যকেই দায়ী করে মেনে নেয়।

প্রশ্ন ১৫ "দিন দিন কেমন যেন হয়ে যেতে লাগল মৃত্যুঞ্জয়"—(ক) মৃত্যুঞ্জয় কে? (খ) সে কেমনভাবে দিন কাটাতে লাগল? ১+১+৩

উত্তর ◊ (ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মৃত্যুঞ্জয়। সে একজন মানবদরদি। মানুষ। সমাজের অবক্ষয়ে তার দায় আছে বলে সে মনে করে। তাই দুর্ভিক্ষে, অনাহারে ক্লিষ্ট মানুষের দুঃখকষ্টের জন্য সে নিজেকে দায়ী বলে মনে করে এবং তাদের পাশে সর্বস্ব নিয়ে দাঁড়াতে চায়।

(খ) মৃত্যুঞ্জয় মানবিকতাবোধে উদ্‌বুদ্ধ। তাই অনাহারে মৃত্যু দেখে বেদনা কাতর চিত্তে দুর্ভিক্ষ পীড়িত নিরন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায়। তাদের মুখে অন্ন তুলে দিতে চায়। শুধু তাই নয়—তাদের আচার, আচরণ কথাবার্তা প্রত্যক্ষ করার প্রতিও তার প্রবল আগ্রহ। তাদের দুঃখকষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, ভাবভঙ্গি—সবকিছুই সে প্রত্যক্ষ করতে চায়। সেই সব প্রত্যক্ষ করে সে দিন দিন যেন কেমন হয়ে যায়—দেরি করে অফিসে যায়, শহরের নানা স্থানে ফুটপাথে ঘুরে বেড়ায়, অফিসে কাজে ভুল করে।

আর যারা ডাস্টবিনের ধারে, গাছের নীচে, খোলা ফুটপাথে পড়ে থাকে, অনেক রাতে দোকান বন্ধ হয়ে গেলে হামাগুড়ি দিয়ে সামনের রোয়াকে উঠে একটু ভালো আশ্রয় খোঁজে, আর ভোর চারটে থেকে যারা লাইন দিয়ে বসে পড়ে, মৃত্যুঞ্জয় তাদের লক্ষ করে। পাড়ায় পাড়ায় লঙ্গরখানায় ঘুরে বেড়ায়—সবার সঙ্গে আলাপ করে, কথাবার্তায় তাদের কথা জানতে চায়। এদের কারও মুখে নালিশ নেই, প্রতিবাদ নেই, কোথা থেকে কীভাবে এমন ওলোটপালোট হল তাও তারা জানে না, বোঝে না, কিন্তু মেনে নিয়েছে। এইভাবেই মৃত্যুঞ্জয় দিন দিন উন্মাদ হয়ে যায়। রাস্তায়, খাদ্যের সারিতে, লঙ্গরখানার লাইনে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে।

Scanned with CamScanner

না। সব কিছু দিয়েও কিছু না করতে পারার ব্যাপারে তার মনে একটা দারুণ হতাশা জেগেছে। এ ব্যাপারটা আমরা তার স্ত্রীর কথাতেও জানতে পারি।

আলোচ্য অংশের বক্তা মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী। গল্পে সে টুনুর মা নামে পরিচিত। মানসিকতার দিক থেকে টুনুর মা মৃত্যুঞ্জয়ের কার্বন কপি। স্বামী তাকে যেভাবে ভাবতে বলেছে, সে সেভাবেই ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছে। টুনুর মা যথার্থভাবেই মৃত্যুঞ্জয়ের অনুগামিনী। একারণেই নিখিলকে সে বলতে পেরেছে—'ওর সঙ্গে থেকে থেকে আমিও অনেকটা ওর মতো হয়ে গেছি। উনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন—আমারও মনে হচ্ছে, আমিও যেন পাগল হয়ে যাব'।

একটা পার্থক্য এই যে, মৃত্যুঞ্জয় তার ছেলেমেয়ে পরিবার পরিজন কারও সম্পর্কে ভাবেনি। কিন্তু টুনুর মা ভেবেছে—মৃত্যুঞ্জয়ের কিছু হলে তার ছেলেমেয়েদের কী হবে—এক অনাগত আশঙ্কা তাকে পেয়ে বসে। বাকী সব ব্যাপারে মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে টুনুর মার মানসিকতার ও জীবনবোধের কোনো পার্থক্য নেই। তারা দুজনেই সম ভাবনার মানুষ। মৃত্যুঞ্জয়ের ভাবনা, চিন্তা, সহানুভূতি, আবেগ, প্রভৃতিকে সহজ ভাবে মেনে নিয়ে টুনুর মা জীবন কাটাতে সচেষ্ট হয়েছে।

প্রশ্ন ১৭ "আগন্তুক মানুষের কোন্ জঞ্জালের মধ্যে তাকে তারা খুঁজে বার করবে"—(ক) কারা কাকে খুঁজে বার করবে? (খ) আগন্তুক মানুষের জঞ্জালের পরিচয় দাও। ১+৪

উত্তর ◊ (ক) কথা সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়কে খুঁজে বার করার কথা বলা হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের ছেলে, বুড়ো সবাই মৃত্যুঞ্জয়কে খুঁজে বার করার চেষ্টায় লেগে পড়ে।

(খ) আগন্তুক মানুষের জঞ্জাল বলতে গ্রাম থেকে শহরে আসা দুর্ভিক্ষপীড়িত নিরন্ন অভাবী মানুষদের বোঝানো হয়েছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত এইসব মানুষগুলি একমুঠো অন্নের আশায় শহরের পথেঘাটে এসে ভিড় জমিয়েছে। অন্য স্থান থেকে আসার জন্য এরা আগন্তুক। শহরের বাসিন্দা এরা নয়। এই মানুষগুলি শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে—ডাস্টবিনের ধারে, গাছের তলায়, রাস্তার পাশে, ফুটপাথে আশ্রয় নিয়েছে। আবার কখনও তাদের দেখা যায় লঙ্গরখানায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে খিচুড়ি খেতে কিংবা মানুষের দরজায় দরজায় ভিক্ষা করতে—কিংবা একটু ফ্যানের জন্য আবেদন জানাতে।

তাই তারা অবাঞ্ছিত-অব্যবহৃত আবর্জনার মতোই অপ্রয়োজনীয় জঞ্জালের মতো। শহরের স্থায়ী বাসিন্দাদের কাছে এই মানুষগুলি ভীষণভাবে অপ্রয়োজনীয়, অনাবশ্যক, অ-দরকারি। শহরের মানুষের জীবনে এদের কোনো কার্যকারিতা নেই—বরং শহরের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহের ক্ষেত্রে এরা প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী জঞ্জাল। একারণেই গ্রাম থেকে আগত মানুষদের শহুরে মানুষের বসবাসের পক্ষে ক্ষতিকারক বলেই জঞ্জাল বলে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১৮ "টুনুর মা তাকে সকাতর অনুরোধ জানায়"—(ক) টুনুর মায়ের পরিচয় দাও। (খ) সে কাকে কী অনুরোধ জানায়? (গ) তার সকাতর অনুরোধের ব্যাখ্যা করো। ১+১+৩

উত্তর ◊ (ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পে টুনুর মা হল গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী—মৃত্যুঞ্জয়ের কন্যা টুনুর মা।

Scanned with CamScanner